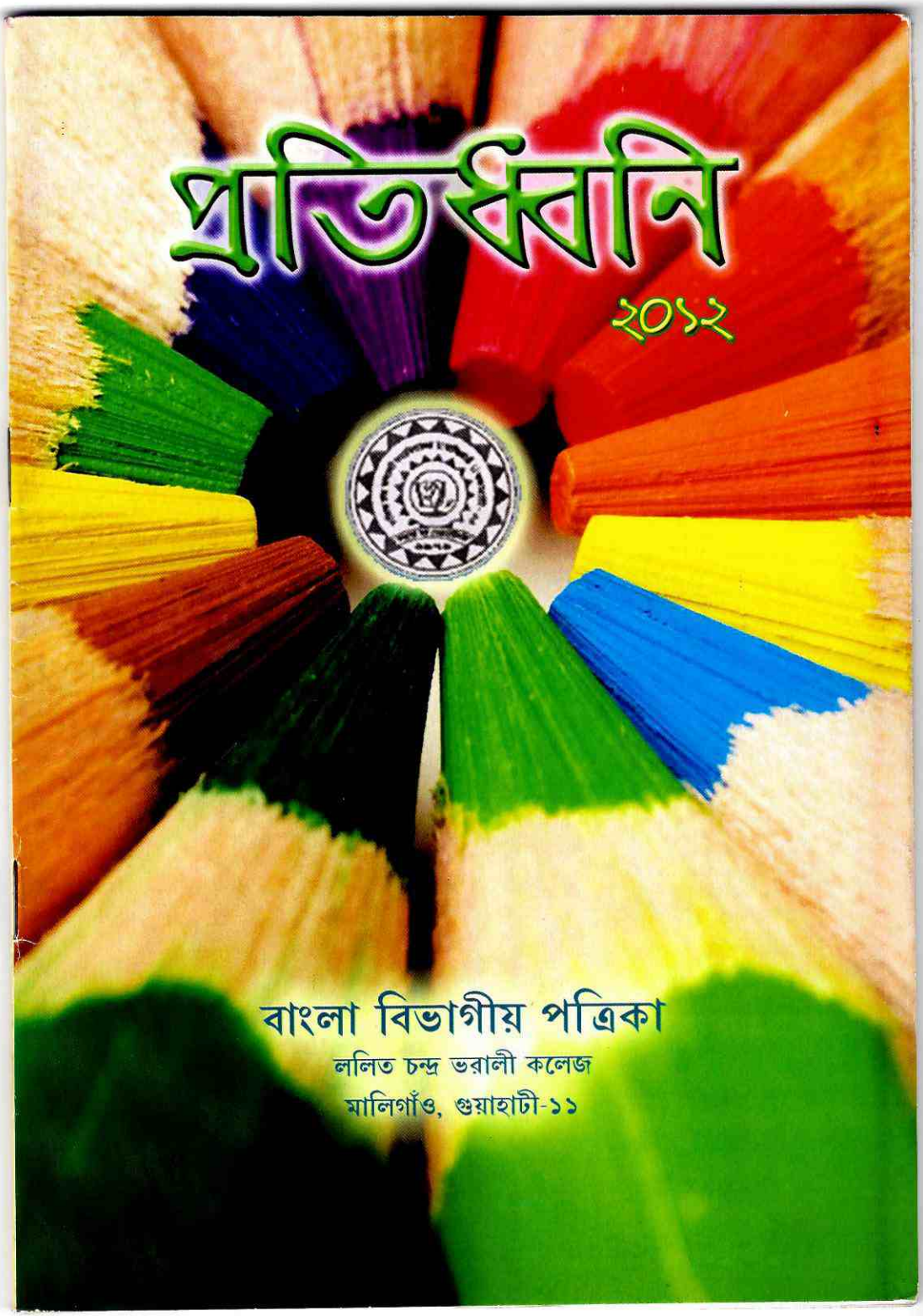
প্রতিধ্বনি
২০১২
বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা
ললিত চন্দ্র ভরালী কলেজ
মালিগাঁও, গুয়াহাটী-১১

প্রতিধ্বনি

২০১২

বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা

ললিত চন্দ্র ভরালী মহাবিদ্যালয়
মালিগাওঁ, গুয়াহাটী-৭৮১০১১

"প্রতিধ্বনি"

বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা

ললিত চন্দ্র ভরালী মহাবিদ্যালয়

মালিগাওঁ, গুয়াহাটী-৭৮১০১১

নবম প্রকাশ

সেপ্টেম্বর, ২০১২

মুদ্রন ঃ বন্দনা এন্টারপ্রাইজ

মালিগাঁও চারিআলি, গুয়াহাটী - ১২

Office of the Principal

LALIT CHANDRA BHARALI COLLEGE

Maligaon, Guwahati-781001, Assam (India)

Ph : (0361) 2570465, 2675259, Fax : 0361-2570466

Dr. N.K. Deka, *M.Sc., Ph.D.*

Principal & Secretary

শুভেচ্ছা বাণী

এখন সমাজৰ বৌদ্ধিক তথা সাংস্কৃতিক বিকাশত আলোচনী এখনৰ ভূমিকা অতি গুৰুত্বপূর্ণ। ললিত চন্দ্র ভৰালী মহাবিদ্যালয়ৰ বাংলা বিভাগৰ আলোচনী "প্রতিধ্বনি" নবম সংখ্যা প্রকাশৰ আয়োজন কৰা বুলি জানিব পাৰি সন্তোষ পোৱাৰ লগতে গৌৰববোধ কৰিছো। এই আলোচনীখনৰ জৰিয়তে বিভাগৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী তথা ছাত্র-ছাত্রীসকলে তেওঁলোকৰ সৃষ্টিকর্ম বিকাশৰ লগতে সমাজৰ বৌদ্ধিক জগতলৈ যোগাব বুলি আশা কৰিলোঁ। ইতি -

ড° নিশিকান্ত ডেকা

অধ্যক্ষ

ললিত চন্দ্র ভৰালী মহাবিদ্যালয়

মালিগাওঁ, গুৱাহাটী

সম্পাদকীয়

দেখতে দেখতে দশ বৎসরে পা দিল ললিত চন্দ্র ভরালী মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের মুখপত্র 'প্রতিধ্বনি'। মাঝখানে কোন বিশেষ কারণে পত্রিকাটি প্রকাশ করা হয়ে ওঠেনি, তাই এই সংখ্যা নবম সংখ্যা 'প্রতিধ্বনি' হিসাবে প্রকাশিত হল। বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের সৃষ্টিশীল প্রতিভাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য সৃষ্ট এই পত্রিকা বিগত দশ বৎসর ধরে তার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। পত্রিকার মাধ্যমে প্রাক্তন বিভাগীয় অধ্যাপিকা ডঃ সুনন্দা দাসকে তাঁর মননশীল রচনাটির জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি, তথা ধন্যবাদ জানাচ্ছি বিভাগের ছাত্র ছাত্রীদের যারা লেখনীর দ্বারা পত্রিকাটিকে পূর্ণ করে তুলতে সাহায্য করেছে। এই সুযোগে মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডঃ নিশিকান্ত ডেকা মহাশয়কে তার সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সহকর্মী সূর্যসেন দেবকে পত্রিকাটি সুসম্পূর্ণ করে তোলার জন্য এবং ছাপা কাজের জন্য সুদর্শন সিনহা ও বিশ্বজিৎ দাসকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মহাবিদ্যালয়ের ছোট একটি বিভাগের সীমিত সংখ্যক ছাত্র ছাত্রী নিয়ে ছোট পত্রিকা প্রতিধ্বনি মাধ্যমে লেখালেখি প্রকাশের দ্বারা বাংলা বিভাগ একটি প্রতিশ্রুতি পালন করে আসছে। ভবিষ্যতের প্রতিধ্বনির শ্রীবৃদ্ধি ও আয়ুবৃদ্ধি কামনা করছি।

ইতি-

শিবানী দে
বাংলা বিভাগ
ললিত চন্দ্র ভরালী মহাবিদ্যালয়

শ্রদ্ধাঞ্জলি

ড০ ভূপেন হাজরিকা
জন্মঃ ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯২৬
মৃত্যুঃ ৫ নভেম্বর, ২০১১

মামনি রয়সম গোস্বামী
জন্মঃ ১৪ নভেম্বর, ১৯৪২
মৃত্যুঃ ২৯ নভেম্বর, ২০১১

— ঃ সূচীপত্র ঃ —

রবীন্দ্রনাথের রতন একবিশ্বব্যাপী বেদনার মূর্ত্তি	ড° সুনন্দা দাস	১
কয়েকটি গান - কিছু কথা	শিবানী দে	৭
বরাক উপত্যকার মনসা পূজা ও ওঝা নাচ	সূর্যসেন দেব	১৫
মায়ের খোঁজে	অরুনাভ ঘোষ	৩১
স্বপ্ন	প্রিয়ংকা চৌধুরী	৩১
এক আশীষ চাহি	আবুল কাসিম তপাদার	৩২
যদি হতাম	চম্পা দে	৩৩

রবীন্দ্রনাথের রতন একবিশ্বব্যাপী বেদনার মূর্তি

ড° সুনন্দা দাস

প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান

বাংলা বিভাগ

ঊনিশ শতকে চারজন ছোটগল্পকার এসেছিলেন। গি দ্য মোপাসাঁ, আন্তন চেখভ, এডগার এলান পোঁ এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সফল ছোটগল্পের জমি অবশ্য আগেই তৈরি হয়েছিল ঔপন্যাসিক মেরিমের হাত। উল্লেখিত চারজন ছোটগল্পকার, সেই আলোয় জেগে ওঠা পাখী, যে নতুন আলোয় পথ দেখিয়েছিলেন ঔপন্যাসিক মেরিমে।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা জীবন ও কাব্যে এক নতুন দিগন্ত। বহুমুখী প্রতিভা নিয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যের জগত আলোকিত করেছিলেন। তাঁর চোখে জীবনের কোন দিকই বোধহয় অবহেলিত পরে থাকেনি।

বেদনার মধ্যে নেমে এসে জীবনের নগ্ন সত্যকে আবিস্কার করেছেন তিনি। সবচাইতে বড় কথা মানুষকে ভালবাসার প্রথম বেদমন্ত্র তিনি শিখিয়েছিলেন।

তাঁর অর্ন্তদৃষ্টি ও প্রবল মানসিক সহানুভূতির ফসল তাঁর ছোটগল্প। উল্লেখযোগ্য যে, যুগচেতনা ও যুগচাহিদা উপন্যাসের বিস্তৃত পরিসরে পাঠককে আর ব্যাপৃত থাকতে সময় দিলনা। তাই পাঠক চাইল 'ছোটগল্প' আর চাইল বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর গভীরতা, যে কারণে মহাপৃথিবীর ছোটগল্পের ভিত্তি তৈরি হলো তারই ঐতিহাসিক অনুস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন ছোটগল্প। সে গল্প দেখা দিল ১৮৯১ সালে সাপ্তাহিক 'হিতবাদী' পত্রিকায়।

আমার প্রবন্ধের বিষয় রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প "পোষ্টমাষ্টার" গল্পের রতন। যদিও পোষ্টমাষ্টার তাঁর প্রাথমিক পর্যায়ের লেখা তথাপি শিল্প নৈপুণ্য ও মননশীলতায় গল্পটির

পরমসিদ্ধি ঘটেছে - একথা বললে অত্যুক্তি হয় না। তার কারণ মানসিক সহানুভূতির অভাবে মানুষের মন শুকিয়ে যায় গল্পের শেকর মাটি থেকে আলগা হয়ে পড়ে।

জীবনে জীবন যোগ করা.....

না হলে, কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা। এখানেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পৃথিবীর অন্য ছোটগল্পকারের পার্থক্য। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ্য, ফরাসী ছোটগল্পকার মোপাসাঁ যদিও তিনি ছোটমানুষকে সহানুভূতির চোখ দিয়ে দেখেছিলেন কিন্তু আপনজন বলে স্নেহ ভালবাসা দিতে পারেননি। এই আভিজাত্যের অহঙ্কারই মোপাসাঁকে রবীন্দ্রনাথ থেকে আলাদা করে দিল, অপরদিকে রবীন্দ্রনাথ, ছোটপ্রাণের ছোট কথাকে, ছোট মানুষের দুঃখবেদনাকে, সহজ সরল মন দিয়ে যাচাই করে নিয়েছিলেন, ভালও বেসেছিলেন গভীর ভাবে। এই যে হৃদয় উৎসারিত ভালোবাসা তারই একটি দান হল রতন।

ছোটগল্পের চরিত্র সৃষ্টিতে কোন বাধা তাই মানেননি তিনি। কোন সীমাবদ্ধ সংকীর্ণতায় আবদ্ধও হননি। অতি সাধারণ উলাপুর গ্রামের অশিক্ষিত ছোটমেয়ে রতন এক উজ্জ্বল মানিক্যরূপে এই জন্যই রবীন্দ্র সাহিত্যে এক বিস্তৃত স্থান দখল করে নিয়েছে।

উলাপুর একটি ছোট গ্রাম। শ্রাবণমাসের বর্ষনে খাল, বিল, নালা সমস্ত জল ভরে যায়। অহর্নিশি ভেকের শব্দ, বাউলের গান। একটি পোষ্ট অফিস নীলকুঠি সাহেবের বহু প্রচেষ্টায় এখানে স্থাপিত হয়েছে। শিক্ষিত মানুষেরা এ গ্রামে আসতে ভয় পায় বৈকি। তথাপি জনবহুল কলকাতা শহরের এক যুবক গ্রামে সাব পোষ্টমাষ্টারের চাকুরী নিয়ে এসেছেন। নিঃসঙ্গ পোষ্টমাষ্টারের সময় অফুরন্ত। কোন কাজ না পেয়ে কবিতা লেখার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু ভাব দানা বেঁধে উঠতে পারেনি।

প্রবাসে একা একা বসে মা, দিদি, ভাইয়ের কথা ভেবে ব্যথিত হৃদয় পোষ্টমাষ্টার মানুষটির নিদারুণ একাকীত্ববোধ ও সঙ্গহীনতার তীব্র অনুভূতি তার মনকে শুধু দিন যাপনের গ্লানিতে ভরিয়ে দিয়েছে। সেই অবস্থায় রতন তাঁর ক্ষীণ সান্ত্বনা ও স্বস্তির

স্থান। সময় কাটাবার জন্য তিনি রতনকে বর্ণপরিচয় হতে শুরু করে যুক্তাক্ষর শিখিয়েছেন। অনেক সময় সুখ দুঃখের কথার ফাঁকে কিছু কিছু পারিবারিক কথা ও আলোচনা করেছেন। যে সমস্ত কথা কুঠিবাড়ীর গোমস্তা বা অন্য কারো সঙ্গে করা শহরের ভদ্রলোকটির পক্ষে সম্ভব ছিলনা। এই ভাবে ধীরে ধীরে রতন দাদাবাবুর কাছে সহজ হয়েছে। এখন সে অনেক সপ্রতিভ! তার স্বজন হারা নিঃসঙ্গ জীবনের অসহায়ত্ব অনেকখানি কাটিয়ে উঠেছে। কখন যে সে দাদা বাবুর পরিবারের বলে নিজেকে অর্ন্তভূক্ত করেছে সে জানে না। কথাপ্রসঙ্গে তাদের মা, দাদা, দিদি বলে চিরপরিচিতজনের মতো উল্লেখ করতো। আজ আর তার জীবনে কোন বিষাদের গ্লানি বা বিচ্ছেদের ছায়া নেই। পোষ্টমাষ্টার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কোন কথা না বললেও আমরা সহজেই অনুমান করে নিতে পারি - রতনকে তিনি গ্রহণ করেছেন প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনের হাতিয়ার হিসেবে। সে কাজ করে দেয়, বিনিময়ে দুটি অন্ন পায়। পোষ্টমাষ্টার তাকে কোনদিন কোনরূপ অর্থসাহায্য করেননি। রতন খুশীমনে, উৎসাহের সঙ্গে দাদাবাবুর সমস্ত হুকুম তামিল করেছে। সান্ধ্যমৌতাতের জন্য তামাক সেজে দিয়েছে। এই সান্ধ্য আসরেই একদিন আমরা রতনের পূর্ব পরিচয় কিছুটা পেয়েছি। সে পরিচয় ও বড় আবছা ("দৈবাৎ দুটি একটি সন্ধ্যা তাহার পরিস্কার ছবির মতো অঙ্কিত আছে)" দাদাবাবুর সব কাজেই তার আনন্দ, সে উনুন জ্বালানো হোক বা নদী থেকে চানের জল আনা, হেঁশেল গোছানো কিংবা প্রয়োজনে আহারের ব্যবস্থাই হোক না কেন। নারীর স্বাভাবিক ধর্মবশতঃ রতন দাদাবাবুর সমস্ত রকমের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে এ সমস্ত কাজ করতো। 'রতন' বলে ডাক পড়লেই সে হাজির। বালিকার আন্তরিক কর্তব্য বোধ ও সেবায় যুগ্ম পোষ্টমাষ্টার তাকে প্রিয়জন বলে অন্তরে স্থান না দিয়ে পারেননি শেষপর্যন্ত।

শ্রাবণের ভরা বর্ষায় দাদাবাবুর জ্বর এলো। নির্জন প্রবাসে, ঘনবর্ষায় অসুস্থ শরীরে তাঁর এক সেবাপরায়ণ শাঁখা পরা কোমল হাতের স্পর্শ মনে পড়ে। তাঁর আকাঙ্খা বৃথা যায়নি। সংসার অনভিজ্ঞা হলেও রতন - নারী। মমতা মধুর হাতে রোগ পরিচর্যায় সে

মায়ের স্থান পূর্ণ করেছে। এ বিষয়ে কোন পক্ষ থেকেই উচিত অনুচিতের প্রশ্ন ওঠেনি। এক পক্ষের ছিল সেবাগ্রহণ করা, অপর পক্ষের ছিল দাদাবাবুকে সুস্থ করে তোলা। রতন ভৃত্যের বেড়াজাল পার হয়ে স্নেহময়ী মায়ের স্থান দখল করে নিয়েছে আপনা আপনি।

পোষ্টমাষ্টার, বেশ কিছুদিন পর সুস্থ হয়ে প্রথম কাজ করলেন অসুস্থতার অজুহাত দিয়ে বদলীর দরখাস্ত। এরপরেই রতনের অজ্ঞাতে তার জীবনে শুরু হল উল্টোরথের পালা। দাদাবাবুর দরবারে কারণে-অকারণে আর ডাক পড়েনি রতনের। সে সামান্য একটু ডাকের প্রতীক্ষায় দিনের পর দিন অপেক্ষা করেছে, বারংবারে যে একই পাঠ তৈরি করেছে, বিনা আহ্বানে ঘরে ঢুকতে সংকোচ বোধ করেছে। অনেক সময় কৌতূহল বা অজানা শঙ্কায় ঘরে উঁকি দিয়ে দেখেছে। দাদাবাবু অন্যমনস্ক ভাবে শুয়ে বসে রয়েছে। সে কী করে জানবে দাদাবাবু এখন দরখাস্তের জবাবের প্রতীক্ষায় আকাশ কুসুম রচনায় ব্যস্ত।

বদলী নামঞ্জুর হলো। পোষ্টমাষ্টার চাকরী ছেড়ে দিয়ে বাড়ী যাওয়া স্থির করে রতনকে জানালেন তিনি আর ফিরে আসবেন না। সে দাদাবাবুর সঙ্গী হবার বাসনা জানিয়েছে। তিনি হেসে জানিয়েছেন 'সে কী করে হবে? নগর সভ্যতায় শিক্ষিত যুবক জানেন, অজ্ঞাত কুলশীল, আত্মীয় পরিজনহীন পল্লী বালিকাকে সমাজ গ্রহণ করবে না। সারারাত নিদ্রায় জাগরণে এই ছোট্ট বাক্যটি তার অন্তরে গভীর থেকে গভীরতর ক্ষত সৃষ্টি করেছে।

বহুদিন হল রতন সংসারের পাঁচজনকে হারিয়েছে, আরো আশ্রয়হীনা অনাথা পল্লীবালিকার মতো বেঁচে ছিল সে। পোষ্টমাষ্টারের আগমনে নিরাপদ আশ্রয় ও স্নেহবাৎসল্য পেয়ে সে সমস্ত দুঃখ ভুলেছিল। জানিনা, এই সংসার অনাভিজ্ঞা বালিকার মনে দাদাবাবুর জন্য কোনরকমের দুর্বলতা জন্মে ছিল কিনা? কিন্তু তাঁর অগস্ত্যযাত্রার কথা শুনে রতন বাক্যহারা। অপ্রাপ্যকে পেয়ে হারানোর ব্যথা বড়োই নিদারুণ ট্র্যাজেডি।

একদিন অলক্ষে দাদাবাবু ও রতনের মধ্যে যে নিবিড় স্নেহের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল বিদায়বেলায় এ আর স্মৃতি সুধা দিয়ে ভরা গেল না। দাদাবাবুর প্রত্যাখ্যান স্নেহশীলা বালিকার দুঃখ বেদনাকে দুগুন ভারী করে তুলেছে। পোষ্টমাষ্টার বাড়ী ফেরার আনন্দে রতনের বেদনার পরিমাপ করতে পারলেন না। তিনি ভেবেছেন নিরাশ্রয় হবার ভয়ে রতনের এই আচরণ। গ্রাম ত্যাগ করার আগে বলেছেন, নতুন পোষ্টমাষ্টারকে বলে যাবেন, তাকে ভালোভাবে রাখবার জন্য। রতন দাদাবাবুর বহু তিরস্কার নীরবে সহ্য করেছে। তাই কোমল স্বরে কাঁদতে কাঁদতে বলেছে, "না, না তোমায় কাউকে কিছু বলতে হবে না, আমি থাকতে চাই না।" পোষ্টমাষ্টার রতনের মনের খবর রাখতেন না, তাই তার এই আচরণে অবাক হয়েছেন। রতনের সহিষ্ণুতার বাঁধ ভেঙ্গে যায় তখনই যখন পোষ্টমাষ্টার তাকে কিছু অর্থ সাহায্য করতে চায়। সে তো স্নেহের কাঙালী, অর্থের প্রত্যাশী নয়। রতন যখন অভিমানে প্রচণ্ড ক্ষোভে কাঁদতে কাঁদতে বলে "দাদাবাবু, তোমার দুটো পায়ে পড়ি, আমার জন্য কাউকে কিছু ভাবতে হবে না।' তখন আমাদের মনেও কি ক্ষোভের সৃষ্টি হয়না? বিদায় মূহুর্তে তাকে কোথাও দেখা গেল না।

রতনের সমস্ত স্নেহ ভালবাসার মায়া মোহ ত্যাগ করে পোষ্টমাষ্টার সোনারতরীর নাবিকের মত সত্যিই একা বিদায় নিলেন। শেষ সময়ে দাদাবাবুর মনে "একটি সামান্য গ্রাম্যবালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল।" তাকে ফিরিয়ে আনার কথাও একবার ভাবলেন। কিন্তু এই আবেগ মূহুর্তের, আত্মতুষ্টির জন্য শিক্ষিত যুবকের মনে এল 'জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কী? পৃথিবীতে কে কাহার? অশিক্ষিত বালিকার নিজেকে সান্ত্বনা দেবার কোন ভাষা তত্ত্বজ্ঞানই জানা ছিলনা। ক্ষীণ আশা নিয়ে পোষ্টআপিসের চারিদিকে ঘুরে বেড়িয়েছে। কি জানি, যদি দাদাবাবু ঘুরে আসে?

কি নিষ্ঠুর স্নেহের বন্ধন। সংসারের লাভ লোকসানের খাতায় যার কোন মূল্য নেই। কালের স্রোতে দাদাবাবুর মন থেকে রতন হারিয়ে যাবে। কিন্তু যুগান্তরের পাঠকের

মনে রতন বেঁচে থাকবে মূল্যবান রতনের মতই।

মিলন এবং বিচ্ছেদ প্রকৃতির বহির্ভূত নয়। বিশ্বনীতির বিধানেই পোষ্টমাষ্টারকে বিদায় নিতে হয়েছিল। রতনের দীর্ঘশ্বাসের প্রকৃতি কোন দায়িত্বই গ্রহণ করেনি। একটি সাধারণ পল্লীবালিকার দুঃখকাতর মুখচ্ছবি গল্পের শেষে এক অব্যক্ত বেদনার আর্তি হয়ে থাকল।

কৌতুক

১) এক জুয়ারীকে ধরে আনা হয়েছে থানায়। সে দারোগাকে বলল, "স্যার, আমাকে থানায় ধরে আনলেন কেন"?
দারোগা বললেন, "বুঝতে পারছিস না, জুয়া খেলার জন্য"?
জুয়ারী, "বাঃ খুব ভাল, তো কোথায় বসে খেলবেন স্যার"?

২)
আন্টি ঃ পৃথিবীর আকৃতি কি রকম তুলি?
তুলি ঃ জানি না আন্টি। তুমি বলে দাও কি রকম।
আন্টি ঃ আচ্ছা বুঝিয়ে দিচ্ছি। বলতো তোমার দিদি কানে কী রকম দুল পরেন?
তুলি ঃ লম্বা।
আন্টি ঃ রোজ কি তাই পরেন?
তুলি ঃ না, গত রবিবারে গোল পরেছিলেন।
আন্টি ঃ বাঃ ঠিক এইরকম। এবার তুমি নিজের মুখে বলো পৃথিবীর আকৃতি কি রকম?
তুলি ঃ সপ্তাহে ছদিন লম্বা, আর রবিবারে গোল।

৩)
গার্ড ঃ দেখছো না, নোটিসবোর্ডে লেখা, এখানে মাছ ধরা বারণ।
মাছ শিকারি ঃ আমি মাছ ধরছিনা। আমি আমার কেঁচোটাকে সাঁতার শেখাচ্ছি।

পম্পী সাহা
প্রাক্তন ছাত্রী

কয়েকটি গান - কিছু কথা

শিবানী দে
বাংলা বিভাগ

বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকের তথা একবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকের অসমের সাংস্কৃতিক জগতের এক কালজয়ী প্রতিভা হলেন ডঃ ভূপেন হাজরিকা। মানবতাবাদের পূজারী এই শিল্পীর গানে শুধু অসমের জনজীবন নয়, পৃথিবীর শোষিত, নিষ্পেষিত লাঞ্ছিত জনগণ তথা সামাজিক, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ন্যায় থেকে বঞ্চিত, যন্ত্রনার যাতাকলে নিষ্পেষিত জনগণের ক্ষোভ, ক্রোধ, বার বার সুরের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে। বিশ্ববিশ্রুত সংগীত শিল্পী, অসম রত্ন ডঃ ভূপেন হাজরিকা রচিত কয়েকটি গানের আলোচনার মাধ্যমে ডঃ হাজরিকার মানবপ্রেমিক মনটিকে পাঠকের সামনে তুলে ধরার প্রয়াস করা হল। ডঃ হাজরিকা অসমের সাংস্কৃতিক জগতকে নিজে প্রতিনিধিত্ব করে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরেছিলেন। অসমের বাইরে তাঁকে দিয়েই অসমের পরিচয়, তাঁর হাত ধরেই পথচলা, ভাষার স্বীকৃতিলাভ, জাতির স্বীকৃতিলাভ।

বিশ্ব বরেণ্য এই শিল্পীর জীবনের মূলমন্ত্র ছিল মানবপ্রেম, যার সরল এবং সোজা অর্থ হল মানুষকে ভালোবাসা। 'মানুষ মানুষের জন্যে, জীবন জীবনের জন্যে' এই মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন তিনি। গানের মাধ্যমেই তিনি নিজের জয় সাব্যস্ত করেছিলেন। তার গানেই লুকিয়ে রয়েছে সকল অসমবাসীর উজ্জীবনের মন্ত্র। জাতি- ধর্ম-বর্ণ-ভাষা নির্বিশেষে সমস্ত অসমবাসীর প্রিয় ভূপেন হাজরিকা, জীবনের বেশীর ভাগ সময় অসমের বাইরে কাটালেও নিজ জন্মভূমির প্রতি দায়বদ্ধতা তথা ভালোবাসা তার সবসময় অটুট ছিল। তিনি তাঁর গানে বলেছিলেন, -

"অসম আমাৰ ৰূপহী গুণৰো নাই শেষ।
ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশৰ সূৰ্য্য উঠা দেশ।"

সুধাকণ্ঠ ডঃ ভূপেন হাজরিকা জীবন ও জগতকে অত্যন্ত সূক্ষ্মরূপে অধ্যয়ন করেছিলেন। তাই মানবজীবনের বিভিন্ন ধরণ বিভিন্ন পর্যায় তাকে সবসময় আকৃষ্ট করতো, যার ফলে তাঁর প্রত্যেকটি গানেই মানবতাবাদের সুর প্রতিধ্বনিত হয়। রোমান্টিক কল্পনার প্রবহমানতায় নিজেকে ভাসিয়ে না দিয়ে তিনি বাস্তব জগতের কঠোর, কঠিন রূপকে গানের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। মানবপ্রেমের বাণী বহনকারী তাঁর গানগুলো মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থলে গিয়ে ঘা দেয়। মানুষকে জাগিয়ে তোলে। কিছুক্ষণের জন্য হলেও। জীবনও জগতকে অতি সূক্ষ্মরূপে অধ্যয়ণ করা এই গায়ক কবি শিল্পী শোষণে জর্জরিত, নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষের পক্ষ নিয়ে গেয়েছিলেন মিলনের গান -

অগ্নিযুগৰ ফিৰিঙতি মই
নতুন অসম গঢ়িম।
সর্বহাৰাৰ সর্বস্ব পুনৰ ফিৰাই আনিম।।
নতুন অসম গঢ়িম।
নৰকংকালৰ অস্ত্র সাজি
শোষণকাৰীক বধিম
সর্বহাৰাৰ সর্বস্ব পুনৰ ফিৰাই আনিম।।
ধর্ম ব্যৱসায়ীৰ ঠাই নাই তাত
জাতিৰ অহংকাৰ লয় পাব তাত
অস্পৃশ্যতাৰ মহা দানবক
আপোন হাতেৰে নাশিম
নতুন অসম গঢ়িম।
হৰিজন পাহাড়ী হিন্দু মুসলীমৰ
বড়ো কোচ চুতীয়া কছাৰী আহোমৰ

অন্তৰ ভেদী মউ বোৰাম
ভেদাভেদৰ প্রাচীৰ ভাঙ্গি
সাম্যৰ সৰগ ৰচিম।

সর্বহারার সর্বস্বকে তিনি ঘুরিয়ে আনার অঙ্গীকার করেছেন তথা বিভিন্ন জাতি-উপজাতি, নানা ধর্ম-বর্ণ অধ্যুষিত অসমবাসীর মধ্যে সাম্যের স্বর্গ রচনার মনোবাসনা তিনি এই গানের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। মানবতার পূজারী এই গীতিকার তাঁর এই গানের মাধ্যমে বলতে চেয়েছেন যে তিনি সমাজের শোষণকারীদের বিনাশ করার জন্য নরকঙ্কালের অস্ত্র তৈরি করবেন। মূলতঃ শোষণকারীদের প্রতি থাকা শিল্পীর এক চরম ঘৃণার ভাব ফুটে উঠেছে 'নর কঙ্কালের দ্বারা তৈরি অস্ত্র' কথাটির মাধ্যমে। ধর্ম নিয়ে যারা ব্যবসা করে তাদের তিনি সমাজে ঠাঁই দিতে নারাজ, কারণ ধর্ম নামক বস্তুটি মানুষের মধ্যে ভেদভাব আনার এক প্রধান উপকরণ । শিল্পী বলছেন, অস্পৃশ্যতারূপ যে মহাদানব, সেই দানবও ধর্ম থেকেই সৃষ্টি হয়, এই অস্পৃশ্য বস্তুটিকেও তিনি নিজের হাতেই বিনষ্ট করবেন। এই গানটির মধ্যে নিহিত অর্থ তথা তার বিপ্লবী ভাষার জন্য তাকে সাতদিন জেলে কাটাতে হয়েছিল, তাও আবার আমেরিকায়, যখন বিচারক জানতে পারলেন যে এই গানটি সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের বিরুদ্ধে লেখা হয়েছে তখন তাকে কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হয়।

মানবদরদী এই গণশিল্পীর প্রতিটি গানেই রয়েছে এক একটি নতুন ভাবের প্রকাশ। নিম্নলিখিত গানটির মাধ্যমে তা অনুভব করা যায়।

তুমি নতুন পুৰুষ, নতুন নাৰী
অনাগত দিনৰ জাগ্রত প্রহৰী
কেঁচা জীৱন সোতক দ্বিগুণ কৰি
সজাবা সমাজ নিজ হাতেৰে গঢ়ি
বজাবা তুমি আশাৰ গগণা

নোপোৱাৰ হাহাকাৰ নোহোৱা কৰি
মৃতঞ্জয়ী তুমি
কৰিবা দমন
শোষকৰ দংশন
নোহে চিৰন্তন
সংকল্প তোমাৰ
হ'বই সফল
দুর্বাৰ সাহসৰ পথ উজ্জ্বল।।

তুমি নব সপোন, নব অংগীকাৰ
তুমি নব সংগ্রাম, শত শত ঝংকাৰ
বিপদৰ প্রস্তৰ বিচূর্ণ কৰি
সজাবা নতুন পথ হাতেৰে গঢ়ি

বজাবা তুমি আশাৰ গগনা
নোপোৱাৰ হাঁহাকাৰ নোহোৱা কৰি।

এই গানের মাধ্যমে শিল্পীর সমাজ সচেতন মনটি পাঠকের চোখে ধরে পড়বে। তিনি যুব প্রজন্মকে কিছু উপদেশ দিয়েছেন এই গানের মাধ্যমে তাদের তিনি অনাগত দিনের জাগ্রত প্রহরী বলে উল্লেখ করেছেন। সমাজের সমস্ত অন্যায়, অবিচার, হিংসা, হত্যা, শোষণ ইত্যাদির অন্ধকার দূর করে এই জাগ্রত প্রহরী সমাজে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করবে। তার জন্য এদের যদি মৃত্যুকে বরণ করতে হয় তাতেও তারা যেন পিছপাও হয়না। কারণ সমাজ থেকে অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার দূর করতে গিয়ে কেউ যদি মারা যায় তাহলে সে মৃত্যুঞ্জয়ী। মৃত্যুর হাত থেকে কোনো জীবই রক্ষা পেতে পারেনা, কিন্তু যারা অমর কীর্তি রেখে যায়, তারা পৃথিবীতে অমর হয়ে থাকে। নশ্বর দেহকে ত্যাগ

করলেও তাদের কীর্তি তাদের মৃত্যুঞ্জয়ী তথা অমর করে রাখে। তাই তিনি যুবপ্রজন্মকে প্রয়োজন বোধে স্ব স্ব কীর্তির মাধ্যমে নিজেকে অমর করে রাখতে উপদেশ দিয়েছেন, শোষণকারীরা চিরকাল শোষণ করতে পারবেনা, একসময় শোষিতরা জেগে উঠবেই, লড়াই করবেই। এই লড়াই-এর সংকল্প নিয়ে, মৃত্যুর ভয়কে ঠেলে দিয়ে, দুর্বার সাহস বুকে নিয়ে যুব প্রজন্ম এগিয়ে যাক- কবি সেটাই কামনা করছেন। শুধু শোষণকারীর বিরুদ্ধে নয়, সমাজের সকল অন্ধ কুসংস্কার, সমস্ত দুর্নীতির বিরুদ্ধেও রুখে দাঁড়াবার জন্য শিল্পী এদের এগিয়ে যেতে বলেছেন। কারণ নতুন পুরুষ তথা নতুন নারীরা চোখ মেলে চাইলেই সমাজের উন্নতি অবশ্যসম্ভাবী। নতুন পথ গড়ে, বিপদের ভয় ত্যাগ করে, সংগ্রাম করার নতুন অঙ্গীকার গ্রহনের বাণীই এই গানের ছন্দে ছন্দে ফুটে উঠেছে।

সমাজের পরিস্থিতির ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন কবি, শিল্পী ডঃ ভূপেন হাজরিকা জনজীবনের বিভিন্ন দিককে অবলম্বন করে অনেক গান রচনা ও সুরারোপ করেছিলেন। এর মধ্যে তাঁর একটি বিখ্যাত গান হল। 'দোলা হে দোলা'।
সামন্ত জমিদারদের যুগের একটি আখ্যান এখানে ইতিহাস হয়ে রয়েছে।

দোলা হে, দোলা হে দোলা, হে দোলা
একা বেঁকা বাটেৰে কঢ়িয়াওঁ কঢ়িয়াওঁ
বৰ বৰ মানুহৰ দোলা।
হে দোলা'
আপোন কৰিলোঁ বনুৱাৰ জীৱনক
দেহা ভাগৰাই তোলা, হে' তোলা।
হেইয়া না, হেইয়া না, হেইয়া না, হেইয়া।
দোলাৰ ভিতৰত তিৰ্‌বিৰ্ কৰিছে
চহকী পাটৰে পাগ
ঘনে ঘনে দেখিছোঁ লৰচৰ কৰিছে

শুকুলা চোঁৱবৰ আগ
মোৰহে ল'ৰাটিক এইবাৰ বিহুতে
নিদিলোঁ সূতাৰে চোলা।
চকুলোঁ ওলালেও মনটি নেভাঙো
কঢ়িয়াই লৈ যাওঁ দোলা।

যুগে যুগে জাপি দিয়ে মেটমৰা বোজাটি
কান্ধ ভাঙো ভাঙো কৰে,
বৰ বৰ মানুহে দোলাত টোপনিয়ায়
আমাৰ হে ঘামবোৰ সৰে অ' সৰে।
ওখকৈ পাহাৰৰ টিংটিত উঠিছোঁ
ভালকৈ খোজটি মিলা
আমাৰ কান্ধৰ পৰা পিছলিব লাগিলে
বাগৰি পৰিব দোলা।
অ' ৰজা মহাৰজাৰ দোলা
বৰ বৰ মানুহৰ দোলা।।

গানটিতে যে চিত্রকল্পটি রয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে দোলাভারীরা অর্থাৎ পাল্কীবাহকরা পাল্কী ঘাড়ে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, পাল্কীতে বসে রয়েছেন তাদের জমিদার। সামন্ত তান্ত্রিক প্রথায় নিম্নশ্রেণীর খেটে খাওয়া মানুষের শ্রমার্জিত মূল্য পুরোপুরি দেওয়া হয়না। যারা পরিশ্রম করে, সমাজের ভিত্তি প্রস্তর যাদের গায়ের ঘাম ফেলে তৈরি হয় তারা সারাদিন প্রাণপাত পরিশ্রম করে দিনান্তে দুমুঠো খেতে পায়। নিম্ন শ্রেণীর খেটে খাওয়া মানুষের প্রতি শিল্পীর ছিল এক উদার প্রীতি। তাই আজকের দিনে অতীত হয়ে যাওয়া পাল্কীবাহকরাও কবির গানে ঠাঁই পেয়েছে। মূলতঃ এই ধরণের বিষয়বস্তু নির্বাচনের মাধ্যমেই তিনি অন্যান্য গায়ক শিল্পীদের থেকে স্বতন্ত্র। দোলাভারীর

জীবনের দুঃখকে তিনি এই গানের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। দোলা ঘাড়ে করে নিয়ে যেতে যেতে দোলাতে আরোহন করা বড়লোকের পরিহিত পাটের কাপড় খানিকটা দেখা যাচ্ছে। তা দেখে দোলাভারীর নিজের দুঃখের কথাই মনে পড়েছে। পায়ের ঘাম মাথায় ফেলে পরিশ্রম করেও তারা এত কম পারিশ্রমিক পায় যে সে এবার বিহুতে তার ছেলেটিকে কাপড় তো দূর, একটি সূতাও দিতে পারেনি। পাহাড়ের রাস্তায় দোলা টানতে দোলাভারীদের কাঁধ ভেঙে যাচ্ছে, কিন্তু দোলার ভেতর আরাম করে রাজার মতো বসে রয়েছে বড়লোক কোন একজন। গানের মাধ্যমে দোলাভারীর নানা কষ্টদায়ক অনুভুতির সরল বর্ণনার দ্বারা মূলত দোলা সংস্কৃতি তথা সামন্ত সংস্কৃতির প্রতি কটাক্ষ করেছেন এবং অচিরেই এর বিলুপ্তি কামনা করেছেন গায়ক।

জনপ্রিয় এই শিল্পী যে গানটির মাধ্যমে বিশ্বপরিচিতি লাভ করেছিলেন সেই গানটি হলো—

মানুহে মানুহৰ বাবে
যদিহে অকনো নাভাবে
অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনেনো কোৱা?
সমনীয়া?
মানুহে মানুহক বেচিব খুজি
মানুহে মানুহক কিনিব খুজি
পুৰণি ইতিহাস দোহাৰিলে
ভুল জানো নহ'ব কোৱা;
সমনীয়া?
দুর্বল মানুহে যদি
জীৱনৰ কোবাল নদী
পাৰ হয় তোমাৰে সাহত

তুমি হেৰুৱাবানো কি?
মানুহ যদিহে নহয় মানুহ
দানৱ কাহানিও নহয় মানুহ
যদি দানৱ কাহানিবা হয়েই মানুহ
লাজ পাব কোনেনো কোৱা?
সমনীয়া?

এই গানটি বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ গীত হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। কালজয়ী এই গানটি প্রকৃতপক্ষে ডঃ হাজরিকার এক বিপ্লবাত্মক মনোভাবেরই স্ফুরণ, মানুষের প্রতি মানুষের হিংসা, ঈর্ষা, দ্বেষযুক্ত মনোভাব মানবতাবাদী এই শিল্পীকে ব্যথিত করেছে। মানুষকে কেনা-বেচা করে দাস ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে মানুষের সঙ্গে পশুরচেয়েও অধম ব্যবহার করা হতো। দুর্বলের প্রতি সবলের এই ব্যবহারের কথাই শিল্পী তার গানের মাধ্যমে আমজনতার দরবারে পেশ করতে চেয়েছেন। শিল্পী তাঁর গানের মাধ্যমে অনুরোধ করেছেন— সবল মানুষ যদি দুর্বল মানুষকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার না করে ও তাদের শোষণ না করে, যদি ওদের সমাজের মূল স্রোতে জায়গা করে দেয়, যদি ওদের জন্য একটু সাহস ও শক্তি খরচ করে তাহলে তার কতটুকুই বা ক্ষতি হবে? মানুষ যদি মানবত্ব হারিয়ে দানবে পরিণত হয় তার মানবকে দানবের কাছেই লজ্জা পেতে হবে।

উপরোক্ত আলোচনার প্রত্যেকটি গানেই রয়েছে মানবতাবাদী ভূপেন হাজরিকার মনের কথা, শুধু এই গানগুলিতে নয়, তাঁর রচিত প্রায় সমস্ত গানেই মানব সচেতনতার সুর নানাভাবে বিকশিত হয়েছে। তার গান কোথাও কোথাও সুরময় কোথাও কোথাও গদ্যময়। যুক্তির সঙ্গে আবেগের এক সুক্ষ্ম মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায় তার লেখায়। যাই হোক যুক্তি, আবেগ, মানবপ্রেম গদ্যময় সুর ইত্যাদি সব কিছু মিলেমিশে ডঃ হাজরিকার গান এক অনন্য বৈশিষ্ট্য নিয়ে স্বতন্ত্র মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছে।

বরাক উপত্যকার মনসা পূজা ও ওঝানাচ

সূর্যসেন দেব
বাংলা বিভাগ

কাছাড় করিমগঞ্জ এবং হাইলাকান্দি এই তিনটি জেলা নিয়ে গঠিত বরাক উপত্যকা বাংলার তৃতীয়ভুবন হিসেবে খ্যাত। ভারতের স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত শ্রীহট্ট (বর্তমানে বাংলাদেশে) ও কাছাড় নিয়ে একটি উপত্যকা ছিল 'সুরমা উপত্যকা'। ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে যখন ভারতবর্ষ স্বাধীন হল তখন শ্রীহট্ট জেলাকে পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হল। আসাম প্রদেশের সঙ্গে থাকা কাছাড়, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি নিয়ে বাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চলটির নাম হল বরাক উপত্যকা। ভৌগোলিক দিকদিয়ে এই উপত্যকার অবস্থান উত্তরপূর্বাঞ্চলের আসাম রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্তে। এর পূর্বদিকে রয়েছে মণিপুর, পশ্চিমে শ্রীহট্ট, উত্তরে উত্তর কাছাড় এবং দক্ষিণে লুসাই পাহাড়। প্রান্তিকায়িত অবস্থান, ভাষিক আগ্রাসন, অস্তিত্ব সংকট, অবহেলা এবং সাহিত্য চর্চায় আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ও বিষয় বৈচিত্র্যে অনেকেই এই উপত্যকাকে বাংলায় তৃতীয় ভুবন হিসেবে চিহ্নিত করতে চান। এই উপত্যকা মূল বঙ্গসংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কেননা এখানকার আশি (৮০) শতাংশ অধিবাসী বাঙালি। বাংলাভাষাই এখানে ভাব বিনিময়ের প্রধান মাধ্যম।

মিশ্র সংস্কৃতির এক উজ্জ্বল উদাহরণ বরাক উপত্যকা। এখানে অধিকাংশ বাঙালির সঙ্গে অসমিয়া, মণিপুরি, ডিমাসা, মার, নেপালি, খাসিয়া, জৈন, শিখ, খ্রীষ্টান, ইসলাম ইত্যাদি বিভিন্ন বিভিন্ন ভাষাভাষি, ধর্মীয় ও জাতি গোষ্ঠির বসবাস রয়েছে। এ উপত্যকায় অধিকাংশই গ্রামবাসী। প্রধান জীবিকা কৃষিকাজ এবং মৎস্য পালন। নদীমাতৃক এই উপত্যকায় লৌকিক দেব-দেবীর মধ্যে দেবী-মনসা বা বিষহরির ব্যাপকতা সবচেয়ে

বেশি। মনীষী বিপিন চন্দ্র পাল এই অঞ্চলে মনসাপূজায় ব্যাপকতা সম্পর্কে বলেছিলেন যে শ্রীহট্ট কাছাড়ে মনসাপূজার ব্যাপকতা দুর্গাপূজায় চাইতেও বেশি। এর প্রমাণ পাওয়া যায় শ্রাবণ মাস এলে। এই সময়ে গ্রামাঞ্চলে বেশিরভাগ ঘরে এমনকী শহরেও অনেক বাড়িতে নিয়মকরে মাসব্যাপী পদ্মাপুরাণ গান করা হয়। আজকের এই হাইটেক যুগেও এই চিত্র লক্ষ করা যায়। প্রতিদিন বিকেল বেলা পুরুষ মহিলারা সম্মিলিত ভাবে বাদ্যযন্ত্র সহযোগে পদ্মাপুরাণ গান করেন। শ্রাবণ মাসের প্রথম দিন থেকেই পদ্মাপুরাণ গান শুরু হয়। এবং শ্রাবণ মাসের শেষ অর্থাৎ সংক্রান্তির দিনে তা শেষ হয়। ওই সময় দেবীর পুজোও দেওয়া হয়। বিভিন্ন কবিদের রচিত পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল কাব্যই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন রাগ-রাগিনী, পয়ার, লাছাড়ির সুরে পাঠ করা হয়। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য চৈতন্যচরণ পালের পদ্মাপুরাণ সংকলন এবং বাইশকবির বাইশা। এছাড়াও দ্বিজবংশী দাস এবং রাধানাথ রায় চৌধুরীর রচিত কাব্যও প্রচলিত আছে। পুরোমাসব্যাপী পদ্মাপুরাণ গানের প্রচলিত কিছু নিয়ম লক্ষ করা যায়। যেমন-

১) শ্রাবণ মাসের প্রথম দিনই সধবা মহিলারা স্নান করে ঠাকুর ঘরে সিংহাসন থেকে পদ্মাপুরাণের বইটি নামিয়ে আনেন এবং সেদিন থেকেই পাঠ শুরু হয়।

২) প্রথম দিনের পদ্মাপুরাণ গানে বা পুথি পাঠে যারা উপস্থিত থাকবেন শেষ দিনেও তাঁদের সকলকে উপস্থিত থাকতে হয়।

৩) লখীন্দরকে দংশনের সময় যাঁরা উপস্থিত থাকবেন লখিন্দরকে 'জিয়ানি' অর্থাৎ প্রাণদানের সময়ও সকলের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক।

৪) এই মাসের মধ্যে যেভাবেই হোক সমগ্র কাব্যটির পাঠ সম্পন্ন করতেই হবে।

এই ভাবে একমাসের ব্রত পালন করে দেবী বিষহরির পুজো দেওয়া হয়। শ্রাবণমাসে এই পুজো হয় বলে এর নাম শ্রাবণী পূজা। তবে শ্রাবণ মাস ছাড়া অন্যান্য মাসেও পঞ্চমীর দিনে দেবীর পুজো হয়ে থাকে। দেবী মনসার সবচেয়ে বড় পূজাটির নাম হল নৌকা পূজা। দুর্গাপূজার চেয়েও এই পূজার আয়োজন বড়। এই পূজাকে

তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা বলেও জানা যায়। যদিও প্রধান দেবী হিসেবে থাকেন মনসা। তবে লক্ষনীয় যে তেত্রিশ কোটি সংখ্যক দেবতার মূর্তি কিন্তু কখনও পাওয়া যায় না। মূর্তির সংখ্যা থাকে সত্তর (৭০) থেকে আশি (৮০) কিংবা তারচাইতে অল্প বেশি। সাত বা আটদিনে মিলে এই পূজা সম্পন্ন হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য - "বাঁশ, কাপড়, মাটি ও রঙ দিয়ে প্রতিমার আধার হিসেবে দীর্ঘতম ৪০ মিটার পর্যন্ত একটি নৌকা নির্মাণ করা হয়। পূজকের ক্ষমতানুযায়ী নৌকাটি সাত পাঁচ বা ত্রিতলা বিশিষ্ট থাকে। প্রতি তলে আলাদা আলাদা কোঠায় একাধিক দেবমূর্তি বসানো হয়। পাটাতলে চাঁদ সত্তদাগর, সনকা, বেহুলা, লখিন্দর, মাঝিমাল্লা ইত্যাদি মনসামঙ্গল সম্পৃক্ত চরিত্রদের মূর্তি স্থাপন করা হয়। মাঘী বা শুক্লা পঞ্চমীতে এক নাগাড়ে ৮ দিন নূন্যতম পাঁচদিন পূজা করা হয়। প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যা নৃত্য সহযোগে মনসামঙ্গল কাব্য গীত হয়। এ ব্যাপার গায়কদের মধ্যে একটা রীতি আছে - কোথাও নৌকা পূজা হচ্ছে শুনতে পেলে গায়ককে দলবল সহ সেখানে গিয়ে গান করতে হয়। লক্ষণীয় যে সমগ্র বাংলাদেশ, আসাম ও বিহারের কিছু অংশে মনসা পূজার ব্যাপক প্রচলন থাকলেও ঠিক এধরণের মনসাপূজা এখন সুরমা বরাক উপত্যকাতেই সীমাবদ্ধ।"[১]

একসময় জমিদার বাড়িতে এবং উচ্চ বিত্তমানদের বাড়িতে এই পূজার আয়োজন হত। কিন্তু অর্থনৈতিক কারণেই বর্তমানকালে ব্যক্তিগতভাবে নৌকাপূজার আয়োজন লক্ষ করা যায় না। বারোয়ারি উদ্যোগেই নৌকাপূজায় আয়োজন করা হয়ে থাকে। তবুও সংখ্যায় তা অনেক কম। শিলকুড়ি, ফুলেরতল দিলখুশ বস্তি সহ আরও বেশ কয়েকটি অঞ্চলে নিয়মিতভাবে প্রতিবছরই নৌকাপূজা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। তৎসঙ্গে মেলারও আয়োজন হয়ে থাকে।

বর্তমানে নৌকাপূজায় যেসকল মূর্তি পাওয়া যায় সেগুলি হচ্ছে-

১) ব্রহ্মা ২) বিষ্ণু ৩) মহেশ্বর ৪) নন্দী ৫) ভৃঙ্গী ৬) দক্ষরাজ ৭) মহাকাল ৮) উমানন্দ ৯) হরিহর ১০) হরগৌরী ১১) পঞ্চানন ১২) অগ্নি ১৩) নৈঋত ১৪) ঈশান ১৫) বায়ু

১৬) যুগলকৃষ্ণ ১৭) মঙ্গল ১৮) বুধ ১৯) বৃহস্পতি ২০) শুক্র ২১) শনি ২২) রাহু ২৩) কেতু ২৪) ষষ্ঠী ২৫) রূপসী ২৬) পঞ্চানন ২৭) সরস্বতী ২৮) রূপসী ২৯) গণেশ ৩০) কার্তিক ৩১) দুর্গা ৩২) ইন্দ্র ৩৩) ধর্মরাজ ৩৪) চিত্রগুপ্ত ৩৫) নারদমুণি ৩৬) আস্তিকমুণি ৩৭) চন্দ্র ৩৮) কল্কি ৩৯) কাত্যায়নী ৪০) ইন্দ্র ৪১) লক্ষ্মীনারায়ণ ৪২) বুদ্ধ ৪৩) বিষহরি ৪৪) নেতা ৪৫) সুকুন্দা ৪৬) চাঁসদাগর ৪৭) ধন্বন্তরি ওঝা ৪৮) বেহুলা ৪৯) লখিন্দর ৫০) লীলাই মাঝি ৫১) শ্রীধর ৫২) গদাধর ৫৩) জটাধর ৫৪) ষষ্ঠীধর ৫৫) বিদ্যাধর ৫৬) শ্রীধর পণ্ডিত ৫৭) দোলাই মাঝি ৫৮) সনকা ৫৯) জয়া ৬০) বিজয়া ৬১) সোমেশ্বরী ৬২) কুবের ৬৩) মৎস্য ৬৪) কূর্ম ৬৫) বরাহ ৬৬) নরসিংহ ৬৭) বামন ৬৮) পরশুরাম ৬৯) শ্রীরাম ৭০) পুতনা ৭১) হিড়ম্বা ৭২) রক্ষাকালী ৭৩) শ্যামাকালী ৭৪) ছিন্নমস্তাকালী ৭৫) ধূমাবতী ৭৬) বগলামূখী ৭৭) কালামূখী ইত্যাদি। সব জায়গায় যে একইরকম থাকে তা নয়। স্থানভেদে ভিন্নতাও লক্ষ করা যায়। দেবী মনসার সঙ্গে অন্যান্য দেবদেবীর পূজার পশ্চাতে প্রচলিত বিশ্বাস এই যে বেহুলার দেবসভায় নৃত্য এবং শ্বশুরকে দিয়ে মনসার পুজো দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেই ঘটনার সাক্ষী ছিলেন এই সকল দেবদেবীরা তাঁই মনসার সঙ্গে এদেঁরও পূজা দেওয়া হয়।

বরাক উপত্যকায় ডরাই বিষহরি নামে আরও এক দেবীর পূজার প্রচলন রয়েছে। নিম্নবর্গীয় লোকদের মধ্যেই এই দেবী অধিক জনপ্রিয়। বিশেষ করে মৎস্যজীবী লোকদের মধ্যে। ডরাই বিষহরি পূজায় সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল নপুংসক পুরোহিতের ভূমিকা। বিশেষত নুপুংসকরাই এই পূজায় একমাত্র অধিকারী। অন্য কেউ এই পূজা করার অধিকার পান না। লোক বসতি থেকে দূরে নির্জন স্থানে এই পূজার আয়োজন করা হয়। প্রত্যেক বাড়ি থেকে মাত্র এক জন করে পূজায় নিমন্ত্রিত হন। কারণ, এই পূজায় অশ্লীলতার মাত্রা এত বেশি থাকে যে শিক্ষিত ভদ্রলোক কিংবা, গুরুজনদের সামনে ছোটদের পক্ষে এ ধরণের কথা শোনা অসম্ভব। এই নুপংসক পুরোহিতদের

বলা হয় 'গুরমা'। এরা না স্ত্রী, না পুরুষ। ফলে তাদের সংসারও থাকে না। নাচ-গানই তাঁদের পেশা। ছোটবেলা থেকেই তারা এ ভাবেই তৈরি হয়। এই ডরাই বিষহরি আসলে মনসাই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, "প্রকৃত পক্ষে অনেক অঞ্চলেই ডরাই বিষহরি একই দেবী বলে গণ্য হন এবং মনসা মূর্তিতে ডরাই পুজার অনুষ্ঠানও বিরল নয়। আশুতোষ ভট্টাচার্য ডরাই বিষহরি এই যুগ্ম অভিধাটি ব্যবহার করেছেন।" [২]

অর্থাৎ দেখা যায় যে বরাক উপত্যকায় মনসা পূজার এক বিরাট ঐতিহ্য রয়েছে। বৎসরের নানা তিথিতে নানাভাবে মনসা দেবী পূজা পেয়ে থাকেন। দেবী মনসার নানা রকম মূর্তির প্রচলনও লক্ষণীয়। যেমন-

করন্ডী, অষ্টনাগ, বিয়াল্লিশ নাগ, ঘট বিষহরি, সিজবৃক্ষ, চতুর্ভুজা, সর্পভূষিতা, পদ্মাসীনা, হংসারূঢ়া ইত্যাদি। এই মনসা পূজার একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয় হচ্ছে ওঝানৃত্য বা ওঝানাচ। শ্রাবণী পূজায় এক মাসব্যাপী পদ্মাপুরাণ গানের পর সংক্রান্তিতে দেবীর পূজার দিনে ওঝানাচ হয়। নৌকা পূজায় প্রতিদিন বিকেল বেলা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত ওঝানাচের আসর বসে। নৌকা পূজায় প্রথমদিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত নাচ চলে। ডরাই বিষহরি পূজায় সমস্ত রাতব্যাপী ওঝানাচ হয়। প্রধানত নপুংসক অর্থাৎ গুরমারাই এই ওঝানাচের একমাত্র অধিকারী। তাই এই ওঝানাচকে গুরমানাচ বলা হত। গুরমারা যেহেতু সমাজে অন্যান্য সাধারণ মানুষের মত মর্যাদা পান না, তাই তাঁদের এই নৃত্য গীতানুষ্ঠানকে গুরমানাচ বলে সমাজে ব্রাত্য করে রাখা হত। কিন্তু কালক্রমে এই গুরমানাচ শুধুমাত্র নপুংসকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। মনসাপূজায় যে ব্যাপকতা সে তুলনায় নপুংসক অর্থাৎ গুরমা নৃত্যগীতি শিল্পীদের সংখ্যা দিন দিন কমে আসছিল। ফলে অন্যান্য শিল্পীরা ও এই নাচের প্রতি মনোনিবেশ করেন। এঁদের অভিধা হয় 'ওঝা'। চিকিৎসক ওঝাদের সঙ্গে কিন্তু এঁদের তফাৎ রয়েছে। এঁরা শুধুমাত্র শিল্পী। নৃত্য, গীতিই এঁদের পেশা। এঁরা সাপের দংশনের চিকিৎসা কিংবা ঝাড়ফোঁক করেন না। তবে এঁরা বিশেষ ধরণের পোশাক পরিধান করেই নাচ করে থাকেন। ধীরে

ধীরে গুরমা নাচের নামটি মুছে গিয়ে এই নাচের নাম হয় ওঝা নাচ। বর্তমানে ওঝানাচ বা ওঝানৃত্য নামটিই প্রচলিত।

মনসামঙ্গল কাব্য বা পদ্মাপুরাণের সম্পূর্ণ কাহিনী নৃত্য-গীতি ও অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শক শ্রোতা এবং ভক্তবৃন্দর সামনে তুলে ধরার সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটির নাম ওঝানৃত্য বা ওঝা নাচ। স্বাভাবিক ভাবেই ওঝা নাচের মূল বিষয় মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনী। দেবী মনসার মহিমা কীর্তন বা প্রচারই ওঝা নাচের মূল উদ্দেশ্য। এই মনসামঙ্গল কাব্য মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ধারার অন্যতম মঙ্গলকাব্য ধারায় সর্বাধিক জনপ্রিয় প্রচলিত কাব্য। মঙ্গলকাব্যগুলিকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন -

১) বৈষ্ণবীয় মঙ্গল কাব্য। উদাহরণ - চৈতন্য মঙ্গল, অদ্বৈতমঙ্গল, কৃষ্ণমঙ্গল, রাধিকামঙ্গল ইত্যাদি।

২) পৌরাণিক মঙ্গলকাব্য উদাহরণ - গৌরীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, রায়মঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল ইত্যাদি।

৩) লৌকিক মঙ্গলকাব্য। উদাহরণ - শিবায়ন, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, রায়মঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল ইত্যাদি।

এই লৌকিক মঙ্গল কাব্যের প্রধান তিনটি ধারা হল- মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল এবং ধর্মমঙ্গল।

নদীমাতৃক বাংলাদেশে মনসামঙ্গল কাব্যেরই প্রচার এবং প্রসার সবচেয়ে বেশি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য -'রামায়ণের কাহিনী যেভাবে মানুষকে আকৃষ্ট করে তাকে অবশেষে রামযাত্রার মাধ্যমে জনমানসের নিকটবর্তী করেছে, প্রাকৃত সমাজের সৃষ্টি হলেও মনসার কাহিনী বাঙালি মনকে সেইভাবে প্রভাবিত করেছে। এ এক বিস্ময়কর ব্যাপার। রামায়ণের ব্যাপকতা, মহাকাব্য সুলভ, গাম্ভীর্য ইত্যাদি সব বিশেষণ- সবাই যেন বাঙালি মন অন্যভাবে দেখতে পায় মনসামঙ্গল কাব্য মধ্যেও। তাই শীতলামঙ্গল, রায়মঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, কপিলামঙ্গল প্রভৃতি অসংখ্য মঙ্গলকাব্যের ভীড়ে মনসামঙ্গল

বরাবরই স্বাতন্ত্র্য পেয়ে এসেছে।"[৩]

অঞ্চলভেদে এই মনসামঙ্গল কাব্যের প্রধান তিনটি ধারা রয়েছে। যেমন- রাঢ়ের ধারা, উত্তরঙ্গীয় ধারা এবং পূর্ববঙ্গীয় ধারা। এরমধ্যে পূর্ববঙ্গীয় ধারার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট হল নৃত্য-গীত-অভিনয়ের মাধ্যমে মনসামঙ্গল কাব্য পাঠ। বরাক উপত্যকায় ওঝানাচের মাধ্যমে আজও এই ঐতিহ্য বজায় রয়েছে। এ ছাড়াও মনসামঙ্গল কাব্যে নৃত্য-গীতি উপাদানের উপস্থিতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মধ্যযুগের বঙ্গদেশে নৃত্য-গীতি চর্চার দলিল হিসেবে ধরা যেতে পারে মনসামঙ্গল কাব্যকে। কারণ, বিভিন্ন কবিরা তাঁদের যেভাবে নৃত্যের বর্ণনা দিয়েছেন এবং শাস্ত্রীয় রাগ-রাগিনীর ব্যবহার করেছেন তা বাস্তব অভিজ্ঞতা ছাড়া সম্ভবপর নয়। তা ছাড়া কাব্যের নায়িকা বেহুলাকে বারবার 'নাচনি বেহুলা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা জানি যে নাচনি বলে একটি সম্প্রদায় রয়েছে। নৃত্য-গীতিই যাদের পেশা। বেহুলাকেও আমরা একজন নৃত্য-পটিয়সী রূপেই দেখতে পাই। এ ছাড়া বাংলা লোকসঙ্গীতের ধারায়ও পদ্মাপুরাণ গান বা মনসাগানের এক বিশেষ জায়গা রয়েছে।

সঙ্গীত ছাড়াও বিভিন্ন কবির মনসামঙ্গল কাব্যে নৃত্যের যে সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায় তাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনিতে দেবসভায় নৃত্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে কাহিনির সম্পূর্ণতা দানে শুরুতে দেবসভায় ঊষা-অনিরুদ্ধ এবং শেষে বেহুলার নৃত্য প্রধান ভুমিকা নিয়েছে। দেবসভায় ঊষা-অনিরুদ্ধের নৃত্যের সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায় দ্বিজবংশী দাসের পদ্মাপুরাণে। বাইশ কবি পদ্মাপুরাণেও নৃত্যের একই রকম বর্ণনা রয়েছে। শুধুমাত্র ঊষা-অনিরুদ্ধই নয় অন্যান্য বিদ্যাধরীদের নৃত্যেরও অতি সুন্দর বর্ণনা করেছেন কবিরা। যেমন-

"অঙ্গভঙ্গ করি নৃত্য করয়ে সুন্দরী।
সন্মুখে বিমুখে ফিরি তালে ভর করি।।
চিত্ররেখা নৃত্য দেখি মোহে দেবসভা।

চিত্ররেখা অবসানে নাচে আসি রম্ভা।।
তালে তালে নৃত্য করে কুবেরের নারী।
মোহিত ইন্দ্রের সভা শুদ্ধ নৃত্য করি।।
নৃত্য দেখি দেবগণ হরষিত মন।
সেইকালে মেনকার নৃত্যে আগমন।।
হাড়িয়া চামর হাতে সুবর্ণের কলি।
ঘন ঘন দেয় যেন মেঘেতে বিজুলী।।
দেখিয়া কৌতুকে সব মেনকার নৃত্য।" [৪]

দেব সভায় ঊষা এবং মর্ত্যের নাচনি বেহুলা একই নারী। স্বর্গ থেকে অভিশাপগ্রস্ত হয়ে মর্ত্যে এসে বেহুলা রূপে জন্মগ্রহণ করেন ঊষা। একই নারী হওয়ার সুবাদে দু'জনের নৃত্যের ধরণ থাকে একই রকম। যেমন-

ঊষার নৃত্য ঃ-

'নৃত্য করে ঊষা যে সুন্দরী
চরণে নুপুর ধ্বনি রুনুঝুনু বাদ্যশুনি
দাঁড়াইল অঙ্গভঙ্গি করি।।
ঊষার মন্দিরা হাত অনিরুদ্ধ দিল ঘাত
পাখোয়াজ করিয়া টনটনি।
তাথা থি থৈ বাজাইয়া মুখেতে তাল বাটিয়া
মোহিত করিল সুরামনি।।
খঞ্জন গমনে হাঁটে পায়ে পায়ে তাল বাটে
দাদ টনছে ঘনঘন।
আর সব দেবলোকে, রঙ্গ দেখে সকৌতুকে
মনসা রহিছে ছিদ্রমন।।

মস্তকে জলের ঘটি দুই হাতে তালবাটি
নাচে কাঁচা সরার উপরে।
এক পায়ে করি ভর যেন দেখি মধুকর।" [৫]

বেহুলার নৃত্য ঃ-

"নৃত্য করে শাহরও কুমারী।
মনোহর বেশ ধরি নৃত্য করে সুন্দরী
হরষিত হইলা ত্রিপুরারী।
চরেণে নূপুর ধ্বনি রুনুঝুনু শব্দ শুনি
দাঁড়ায় কত অঙ্গভঙ্গি করি।
কাঁচা সরা করি ভর যেন নাচে মধুকর
ভাল নৃত্য করে আঁখি ঠারী।
যেমন খঞ্জন পাখী নাচে ঘুরাইয়া আঁখি
দেখিয়া ভুলিল ত্রিপুরারী।।
ক্ষণে নাচে ক্ষণে গায় বায়ু ভরে আসে যায়
দেখিয়া মোহিত ত্রিলোচন।।" [৬]

কবি ষষ্ঠবর দত্ত বেহুলার নৃত্যের একই রকম বর্ণনা করেছেন। তবে তা আরও একটু বিস্তৃত। খঞ্জন পাখীর সঙ্গে ময়ূর এবং হংসের অনুকরণের নৃত্যর সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন তিনি। নৃত্যের বিস্তৃত অংশটি এ রকম -

"যেমন হংস চলন তেমন তার দোলন চলন
যেন হংস পরে হংস বাহিনী
দেখ দেখ ময়ূর চলে শতপঙ্খ মেলি ধরে
যেন বালা নাচে মধুকর....." [৭]

ঊষা এবং বেহুলার নৃত্যের এই বর্ণনা থেকে যে মূল বৈশিষ্ট বা উপাদানগুলি পাওয়া যায় সেগুলি হল- দৃষ্টিভেদ, শিরভেদ, গ্রীবাভেদ, পাদভেদ, ভ্রমরী, হংসচলন, ময়ূর চলন, খঞ্জন গমন, কাঁচা সবার উপর দাঁড়িয়ে নৃত্যকরা, পায়ে নুপুর, নিজে গান গাওয়া এবং মুখে তাল দেওয়া ইত্যাদি। এই সমস্ত কিছুরই পুঙ্খানুপুঙ্খ উপস্থিতি আমরা পাই বরাক উপত্যকার ওঝানাচে। ওঝা শিল্পী যখন নাচ করেন, তখন মনে হয় ঠিক যেন ঊষা বা বেহুলার দেব সভার নৃত্যরই অনুকরণ। এমন কী পোশাক এবং সাজসজ্জায়ও এই মিল লক্ষ করা যায়। নাচে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রগুলিও প্রায় একই থাকে। যেমন মন্দিরা, কাঁসি ইত্যাদি। তবে পাখোয়াজের বদলে ওঝা নাচে পাখাজের ব্যবহার দেখা যায়।

অভিনয় চার প্রকার যেমন- আঙ্গিক, বাচিক, সাত্ত্বিক এবং আহার্য। ঊষা, নাচনি বেহুলা এবং ওঝানাচে এই চারপ্রকার অভিনয়েরেই উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। যেমন -

(ক) আঙ্গিকাভিনয় ঃ-

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং উপাঙ্গের সহযোগে মনের ভাব প্রকাশ করলে আঙ্গিকাভিনয় হয়। প্রধান অঙ্গগুলি হল- শির, হস্তদ্বয়, বক্ষ, কটি, পার্শ্বদ্বয় ও পাদদ্বয়। প্রত্যঙ্গ হল - স্কন্ধদ্বয়, বাহুদ্বয়, পৃষ্ঠ, উদর, উরুদ্বয় ও জঙাঘাদ্বয়। উপাঙ্গ হল- নেত্র, ভ্রু, নাসা, অধর, কপোল ও চিবুক। এই প্রত্যেকটির বিভিন্ন কর্ম রয়েছে। যেমন - শিরকর্ম, দৃষ্টিকর্ম, ভ্রুকর্ম, নাসাকর্ম, অধরকর্ম ইত্যাদি। এই বিভিন্ন কর্মগুলি থেকেই শিরভেদ, দৃষ্টিভেদ, পাদভেদ. চক্ষুভেদ, বাহুভেদ ইত্যাদি পাওয়া যায়। আঙ্গিকাভিনয়ের এইসব কর্ম ও ভেদ পাওয়া যায় ঊষা বেহুলার নৃত্যে এবং সূত্রে ওঝানাচে। যেমন -

দৃষ্টিভেদ ঃ-

'ক্ষণে নাচে গীত গায় ক্ষণে নানা তালবায়
ঈষিতে কটাক্ষ ঘুরে কত।" [৮]

পাদভেদ ঃ-

"চরণে নুপুরধ্বনি রুনুঝুনু শব্দ শুনি"
দাঁড়াইল অঙ্গভঙ্গি করি।" [৯]

শিরভেদ ঃ-

"খঞ্জন গমনে হাঁটে হাতে-পায়ে তাল বাটে
নাচে কাচা সরার উপর।" [১০]

খঞ্জনপাখির চলনক্রিয়াকে সুন্দরভাবে তুলে ধরতে শিরভেদ প্রয়োজনীয়।

ভ্রমরী ঃ-

"পাক দিয়া পদ্মা আগে অঞ্চল পাতিয়া মাগে
অনাথের দেহ স্বামীদান।।" [১১]

(খ) বাচিকাভিনয় ঃ-

পরস্পর কথোপকথনের মাধ্যমে বাচিকাভিনয় হয়। অর্থাৎ মনের ভাবপ্রকাশে ভাষাই এখানে প্রধান। ওঝাশিল্পী একইভাবে সম্পূর্ণ কাহিনিটি নৃত্য-অভিনয়ে মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। ফলে শিল্পী একাই কাহিনির চরিত্রানুযায়ী বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সংলাপ বলেন

(গ) আহার্যাভিনয় ঃ-

নাট্য বিষয়বস্তুর চরিত্রানুযায়ী পোশাক এবং অঙ্গসজ্জা অতি আবশ্যক। অর্থাৎ নাটকের চরিত্রানুযায়ী পোশাক পরিধান করে অঙ্গসজ্জার মাধ্যমে যে অভিনয় তাই হল আহার্যাভিনয়। ওঝানাচে আহার্যাভিনয়ের উপস্থিতি কিছুটা কম লক্ষিত হয়। তবে অঙ্গসজ্জা ও অলঙ্করণে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। একই পোশাক পরেই শিল্পীকে কাহিনির সব চরিত্র, ভুমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়। ফলে এ ক্ষেত্রে শিল্পীকে আরও সুনিপুণ হতে হয়।

(ঘ) সাত্ত্বিকভিনয় ঃ-

সাত্ত্বিক ভাব দ্বারা মনের বিভিন্ন অভিব্যক্তি ও মানসিকতা শারীরিক অবস্থার মাধ্যমে প্রকাশের নামই সাত্ত্বিকভাব পাওয়া যায়। যেমন- স্তম্ভ, স্বেদ, কম্প, বিবর্ণতা, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ ও মূর্চ্ছা। ওঝানাচে এই সাত্ত্বিকভিনয়ের উপস্থিতি ও লক্ষ করা যায়। সুপ্রাচীন কাল থেকে গুরু পরম্পরা ধারার ঐতিহ্য বহন করছে ওঝানাচ। এই ওঝানাচ শিখতে হলে প্রথমেই গুরুর আশ্রয়ে যেতে হয়।গুরুর আশ্রয় ছাড়া ওঝনাচ শেখা সম্ভব নয়। যে কেউ চাইলেই আবার শিষ্য হতে পারেন না। অনেক গুণাবলীর পরীক্ষা করেই শিষ্য বাছাই করেন গুরু। শিষ্যের যে সমস্ত গুণাবলী থাকা বাঞ্ছনীয়। সেগুলি হল ঃ ১, মধুর কণ্ঠস্বর, ২, সু-গায়ক, ৩, সুবেশ ৪, সুন্দর বাচনভঙ্গি, ৫, অভিনয় দক্ষতা ইত্যাদি। তা ছাড়া শিষ্যত্ব প্রার্থীকে পাঁচ থেকে সাত বছর বয়সের মধ্যে হতে হবে। একনিষ্ঠভাবে দশ-বারো বছর শিক্ষালাভের পর গুরুর কাছ থেকে চামর লাভ করেন শিষ্য। এই চামর লাভই হল ওঝানাচ করার অধিকার লাভ করা। উল্লেখ্য, ওঝানাচে এই চামর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। মনসামঙ্গল কাব্যেও ঊষা ও বেহুলার নৃত্যে চামরকে সবচেয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই চামরের বাতাসে সর্বরোগ ও দুঃখ-কষ্ট দূর হয় বলেও বিশ্বাস প্রচলিত রয়েছে। এই চামরটি কালো রঙের হয়। এই চামরে মনসার অধিষ্ঠান বলেও বিশ্বাস প্রচলিত বলেছে। গুরুর কাছ থেকে এই চামর পাওয়ার পরই শিষ্য ওঝাশিল্পীর মর্যাদা পান।

মঙ্গলকাব্যে কবিরা যেমন কাব্যারম্ভ অংশে আত্ম পরিচয় দেন তেমনি ওঝানাচেও শিল্পী নাচের শুরুতে আত্মপরিচয় সম্পূর্ণ ঠিকানা, আদিনিবাস, গুরুর সম্পূর্ণ পরিচয় ইত্যাদি বর্ণনা করেন গীতের মাধ্যমে। গুরুবন্দনা, সব দেব-দেবী বন্দনা, আসর-বন্দনা, দিক-বন্দনা গান করার পর মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনী বর্ণনা করেন। শ্রাবণী পূজায় এবং ডরাই বিষহরি পূজায় একদিন বা দুদিন মিলিয়ে সম্পূর্ণ কাব্য পাঠ করা হয়। নৌকাপূজা যতদিন হবে ততদিনে ওঝানাচ সম্পূর্ণ করা হয়।

চামরের মত ওঝানাচের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল মাটির কাঁচা সরা। মনসামঙ্গল কাব্যে ঊষা এবং কলা কৌশল বেহুলা কাঁচা সরার উপর দাঁড়িয়ে নৃত্যকৌশল প্রদর্শন করেছেন। এই লক্ষ করা যায় ওঝানাচেও। শিল্পী নিজেকে এমনভাবে তৈরী করেন যে কাঁচা সরায় দাঁড়িয়ে নৃত্য প্রদর্শন করবেন অথচ কাঁচা সরা ভাঙবে না। এমন কী বাতাসার উপর দাঁড়িয়েও একই নৃত্য প্রদর্শন করেন ওঝা শিল্পীরা। কাঁচা সরার মত বাতাসাও ভাঙে না।

ওঝনাচের পোশাক ঃ-

ওঝাশিল্পীর পোশাক হল কুড়ি বা ত্রিশ হাত লম্বা সিল্কের কাপড়ে লাল বা হলুদ রঙের পাড় দিয়ে তৈরি কুচিযুক্ত ঘাঘরি। কোমর পর্যন্ত লম্বা সাদা পাঞ্জাবী। কখনও লম্বা হাতা শার্ট পরিধান করা হয়। মাথায় থাকে সাদা পাগড়ি কানে কুন্তল গলায় হার এবং পায়ে থাকে নূপুর। ওঝাশিল্পীদের বিশ্বাস এই যে, ঊষা-অনিরুদ্ধ এই ধরণের পোশাক পরিধান করে দেব সভায় নৃত্য গীত করতেন। মর্ত্য থেকে অভিশাপমুক্ত হয়ে স্বর্গে ফিরে যাবার সময় তাদের উত্তরসূরী হিসেবে ওঝাশিল্পীদের উদ্দেশে এই পোশাক রেখে যান।

বাদ্যযন্ত্র ঃ-

ওঝানাচে প্রাধান বাদ্যযন্ত্র হল পাখাজ। ওঝানাচে দুটি পাখাজের প্রয়োজন হয়। শিল্পীর ডান এবং বাম দুদিকে দু'জন পাখাজ বাদক থাকেন। এ ছাড়াও থাকে রামকরতাল বা বমকরতাল। ছোট করতাল, মন্দিরা কাঁসি। শিল্পীর পায়ে থাকে নূপুর।

বিশ্বায়নের প্রভাবে আধুনিক সংস্কৃতির ছোঁয়া লেগেছে গ্রামীণ সংস্কৃতিতে। ফলে গ্রামীণ লোকসঙ্গীত এবং লোকনৃত্যগুলির মধ্যেও এই চটকদার সংস্কৃতির প্রভাব পড়েছে। বিভিন্ন ধরণের লোকগীতিগুলিতে রিমিক্সের মাধ্যমে নানাভাবে উপস্থাপিত করা হচ্ছে। বিভিন্ন অঞ্চলের লোকনৃত্যগুলিকেও আধুনিক নৃত্যের সংমিশ্রণে নতুনভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। বরাক উপত্যকার ওঝানাচের ক্ষেত্রেও এই প্রক্রিয়া লক্ষ করা

হয়। নিজের শিল্পগুনেই ওঝানাচ ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এর ফলে মনসাপূজার প্রাঙ্গন থেকে ওঝানাচ উঠে এসেছে মঞ্চে। এর কৃতিত্ব শিলচর সঙ্গীত বিদ্যালয় এবং নৃত্যগুরু মুকুন্দদাস ভট্টাচার্যের। প্রথমে মন্দির প্রাঙ্গণে ওঝানাচের মঞ্চে উঠে আসা নিয়ে ধর্মভীরুদের তরফে বাধা এসেছিল। তবে আজ আর সেই বির্তক নেই। ফলে মনসা পূজা ছাড়াও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ওঝানাচ পরিবেশন করা হয়। মঞ্চে সম্পূর্ণ ওঝানাচ প্রদর্শন করা সম্ভব নয় তাই ওঝানাচের দেব সভায় বেহুলায় নৃত্যের অংশটি উপস্থাপন করা হয়। প্রকৃত ওঝাশিল্পীদের ছাড়া নৃত্যশিল্পীরাও ওঝানাচের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। ফলে সঙ্গীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তালিম নিয়ে মঞ্চে প্রদর্শন করেন। স্বাভাবিকভাবেই ওঝানাচটি মঞ্চে প্রদর্শন করার সময় মূল ওঝানাচের কোনও ঐতিহ্যই অনুসরণ করা হয় না। কারণ এখানে দর্শকদের মনোরঞ্জন করাই প্রধান উদ্দেশ্য থাকে। ফলে নাচটি আকর্ষণীয় করে পোশাক, বাদ্যযন্ত্র এবং গানের সুরে আধুনিকতায় ছায়া লক্ষ করা হয়। বর্তমানে বরাকে মূল ওঝানাচের পাশাপাশি আধুনিক ধরণের ওঝা নাচের প্রচলন দেখা যায়। মূল ওঝানাচ এবং আধুনিক ওঝানাচের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য লক্ষ করা যায়। এদের পরস্পরের সঙ্গে তুলনার করলে পার্থক্যগুলি সহজেই চোখে পড়ে। যেমন -

মূল ওঝানাচ	আধুনিক ওঝানাচ
১. মূল ওঝানাচ তিনদিন, সাতদিন বা পনেরো দিনে সম্পূর্ণ করা হয়।	১. আট থেকে দশ মিনিটের মধ্যেই পরিবেশন করা সম্ভব হয়।
২. সম্পূর্ণ মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণ কাব্য নিয়ে এই নাচ।	২. শুধুমাত্র বেহুলার দেবসভায় নৃত্যের অংশটিই পরিবেশিত হয়।

মূল ওঝানাচ	আধুনিক ওঝানাচ
৩. সম্পূর্ণভাবেই গুরু পরম্পরা ধারার ঐতিহ্য বহন করেছে।	৩. প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষাকেন্দ্র নির্ভর।
৪. কালো চামর ব্যবহৃত হয়।	৪. সাদা চামর ব্যবহৃত হয়।
৫. এককভাবে পরিবেশন করা হয়।	৫. এককভাবে হয়। কখনও দলবদ্ধভাবেও হয়।
৬. বাদ্যযন্ত্রশিল্পীরা আসরে বসে সঙ্গীত করেন।	৬. শিল্পীর সঙ্গে মঞ্চে থাকেন। আবার কখনও বাইরে থাকেন।
৭. শিল্পী নিজেই গায়ক।	৭. শিল্পীর সঙ্গে অন্য শিল্পীরা গান করেন।
৮. শিল্পীর মাথায় পাগড়ি পায়ে নূপুর থাকে।	৮. মাথায় পাগড়ি থাকে না। কখনও নূপুর থাকে। তবে বাধ্যতামূলক নয়।
৯. দেবদেবী-গুরু-আসর-দিক-বন্দনা করে নাচ শুরু হয়।	৯. সরাসরি নাচ শুরু হয়।
১০. লোকবাদ্য ব্যবহৃত হয়।	১০. লোকবাদ্যের সঙ্গে আধুনিক বাদ্যযন্ত্রও ব্যবহৃত হয়।

সম্প্রতি বাংলার শাস্ত্রীয় নৃত্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে গৌড়ীয় নৃত্য। প্রত্যেক শাস্ত্রীয় নৃত্যের মূল ভিত্তি লোকনৃত্য। শাস্ত্রীয় নৃত্যের যে চারটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে থাকে তার অন্যতম হচ্ছে গুরুমুখী লোকয়ত ধারা। গৌড়ীয় নৃত্য ও এর থেকে ব্যতিক্রম

নয়। বিভিন্ন লোকনৃত্য ধারার উপাদানেই গৌড়ীয় নৃত্য সমৃদ্ধশালী হয়েছে। গৌড়ীয় নৃত্যে লোকায়ত গুরু পরম্পরা ধারার অন্যতম হচ্ছে ওঝানাচ। ফলে এই দিকদিয়ে ও বরাক উপত্যকার ওঝানাচের মূল্য অপরিসীম।

তথ্য সূত্র -

১. শ্রীহট্ট কাছাড়ের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতির রূপরেখা, রবীন্দ্র স্মৃতি গ্রন্থাগারও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, শিলং ১৯৯৬, পৃঃ ২০৯

২. প্রাচীন ভারতে মাতৃপ্রাধান্য ঃ কিংবদন্তির পুর্নবিচার, চৌধুরী, ড০ সুজিৎ, প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৯৯০, পৃঃ ৭৪

৩. বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতিকোষ, (সম্পাদিত) চক্রবর্তী, ড০ বরুণ কুমার, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটারস, কলকাতা, ২০০৭, পৃঃ ৪২৩।

৪. পদ্মাপুরাণ (মনসামঙ্গল), দাস, দ্বিজবংশী , জেনারেল লাইব্রেরি অ্যাণ্ডপ্রেস কলকাতা, পৃঃ ১০৯-১১০।

৫. ঐ

৬. তবু রঙে ভরা, ভট্টাচার্য, মুকুন্দদাস, শিলচর সঙ্গীত বিদ্যালয়, ২০০৫, পৃঃ ১৩।

৭. ঐ

৮. ঐ

৯. ঐ

১০. পদ্মাপুরাণ সংগ্রহ, পাল, চৈতন্যচরণ, করিমগঞ্জ, পৃঃ ৫৭।

১১. পদ্মাপুরাণ (মনসামঙ্গল) দাস, দ্বিজবংশী, জেনারেল লাইব্রেরি আণ্ড প্রেস, কলকাতা পৃঃ ২২৪।

মায়ের খোঁজে

অরুনাভ ঘোষ
প্রাক্তন ছাত্র

সুন্দর শরৎ, শরতের সকাল
ও সেই সকালের মায়া,
রবির কিরণ দিয়ে মাখা সেই মায়া।
আমার সুন্দর শরতের সকাল,
এই শরতের মাঝেই শুনতেপাই
একটি মিষ্টি সুরের রেশ
মায়ের বন্দনাগান, মহালয়ার মাঝে
মনে হয় ছুটে যাই মায়ের কোলে
প্রাণ ভরে মায়ের আশীষ পেতে...
তাই আমি ফিরি পথে পথে
রূপময় তুলোর মেঘের মাঝে
আনন্দময়ী মায়ের খোঁজে
শরৎ কালের সকাল সাঁজে

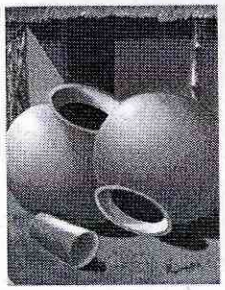

স্বপ্ন

প্রিয়ংকা চৌধুরী
প্রাক্তন ছাত্রী

স্বপ্ন দেখতে ভালবাসি,
তাই স্বপ্ন দেখি রাতভর
স্বপ্ন আমায় সঞ্জীবিত করে তোলে,
তার সোণার কাঠি রূপার ছোঁওয়ায়
স্বপ্ন আলো ছড়ায় আমার মনের কোণে,
অন্ধকার যেখানে জমাট
কিন্তু থমকে যাওয়া বাতাসের ঢেউয়ে ঢেউয়ে
ভেসে যাই আমি
ভুলে যাই কোথায় বাঁধা ছিলাম আমি
স্বপ্ন দিয়ে ভরাই ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে
আমার রাজপাটের গাঁথা
ভেঙে যায় ঘুম সত্যের আঘাতে
দুকুল ছাঁপিয়ে বয়ে আসে
কান্না আর বুকভরা ব্যথা।

এক আশীষ চাহি

আবুল কাসিম তপাদার
স্নাতক ৩য় বর্ষ (বিজ্ঞান বিভাগ)

এক আশীষ চাহি প্রভু
উদ্বেগের ধোয়াশাচ্ছন্ন গগণে
শ্বেতবক উড়ার মতো,
শকুন চিলের আকাশ মাঝে
অগণিত পায়রা ভাসার মতো...
এক বরদান করো আরও
মৃতপ্রায় উদ্যানের
শুকনো কুসুমে
নব কলি ফোটার মতো,
আশীর্বাদ মাগি প্রভু
বসন্তের মর্মর ফ্যাকাসে দিনে
বৃষ্টি ঝরার মতো,
এক পিপাসিত প্রাণ
কোনো জলাধারের পেয় জলে
শান্ত হয়ে উঠার মতো
তপ্ত দুপুরে, তপ্তকায়ে
মৃদু, শীতল প্রজ্ঞা-স্পর্শী মলয়ায়
ক্লান্তি ম্লান করার মতো,
কোনো হারানো শীতের সকালে
শিশির ভেজা ঘাসে
মুক্ত পায়ে
নির্মল হাওয়া বুকে নিয়ে
সূর্য্যোদয় দেখার মতো,
শিশুটি অভিমান ভুলে
মায়ের কোলে ফিরে যাওয়ার মতো
আশীষ মাগি।

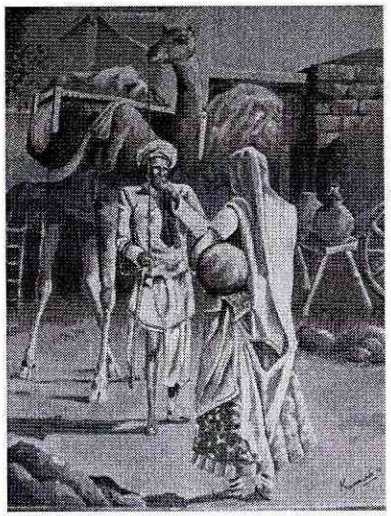

যদি হতাম

চম্পা দে
স্নাতক তৃতীয় ষান্মাষিক

আমি যদি পাখী হতাম
নীল আকাশে উড়ে যেতাম।
ডালে ডালে বসে বসে
মধুর সুরে গান গাইতাম।।
প্রকৃতিতে মিলে-মিশে
সুখে বসে দিন কাটাতাম..
যদি প্রজাপতি হতাম
নানা ফুলে উড়ে বসতাম....
ফুলের মধু খেয়ে খেয়ে
মনের সুখে উড়ে যেতাম
যদি আমি নদী হতাম
স্রোতের টানে ভেসে যেতাম
সুখ নেই, দুঃখ নেই
নতুন পথে পাড়ি দিতাম....

কৌতুক

শিক্ষক ঃ রিনি, বলতো ইংরাজীর সবচেয়ে লম্বা শব্দটি কি?
রিনি ঃ Smile স্যার
শিক্ষক ঃ কীভাবে?
রিনি ঃ S র পরে এক মাইল আছে স্যার।

বই পড়ায় ব্যস্ত এক ব্যক্তিকে তার ছেলে বলল....

ছেলে ঃ বাবা, ভূমিকম্প এসেছে
বাবা ঃ বসতে দে
শিক্ষিকা ঃ যদি তোমরা কিছু না জান তাহলে আমাকে জিজ্ঞাসা করো
ছাত্র ঃ I do not know মানে কি?
শিক্ষিকা ঃ আমি জানি না।
ছাত্র ঃ তাহলে কাকে জিজ্ঞাসা করব?

অলি গুপ্ত
প্রাক্তন ছাত্রী

জাতীয় আলোচনা চক্র, ১৯৯৫ অধ্যক্ষকে সম্বর্দ্ধনা

শিক্ষামূলক ভ্রমণ, শংকরদেব কলাক্ষেত্র, ২০১০

বাংলাবিভাগ আয়োজিত আলোচনা চক্রের একটি দৃশ্য

প্রতিধ্বনি উন্মোচন - ২০১১

শিক্ষক দিবস উদ্‌যাপন - ২০১২

শিক্ষক দিবস উদ্‌যাপন - ২০১১